প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (১৯৬৬-১৯৭৫) : একটি মূল্যায়ণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের

ডক্টরেট অফ ফিলোজফি (পিএইচ.ডি)

উপাধির শর্ত পূরণে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ - এর সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

মনোজিৎ মণ্ডল

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. শিবাশিস চ্যাটার্জী

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২৪

প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা (**১৯৬৬-১৯৭৫**) : একটি মূল্যায়ণ ।

সারসংক্ষেপ (synopsis)

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত দূরদর্শী, সাহসী ও প্রবল জনপ্রিয়তার অধিকারী রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নিপীড়িত বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে নয়মাস ব্যাপী মরনাপন্ন লড়াই করে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারণ, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ছিলেন শাসকগোষ্ঠীর কারাগারে। তবুও দেখা গিয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাবাদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে ক্লান্তিহীন সংগ্রাম চালিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যে নেতার ডাকে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে বাংলার জনগণ জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল সেই নেতার প্রতি মানুষের ভাবাবেগ ক্রমশ লোপ পেতে শুরু করেছিল। অন্যভাবে বলা যায় স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের উপর জনগণের যে প্রবল ভালোবাসা ও প্রশ্নাতীত আনুগত্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে ক্রমশ তা হ্রাস পেতে থাকে। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে কতগুলো বিষয়কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ পরিচালিত সরকারের প্রতি জনমনে বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যেমন, স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠনের বিষয়টি সাদরে গৃহীত হয়নি। কারণ, আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের প্রবল জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে স্বাধীনতা অর্জন যথেষ্ট কঠিন ছিল। পরিতাপের বিষয় দেখা গেছে যে, স্বাধীনতার কৃতিত্বের দাবিদার হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে আওয়ামী লীগ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও বিভিন্ন শক্তির ভূমিকা কার্যত অস্বীকার করেছিল আওয়ামী লীগ। এছাড়াও স্বাধীন বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের মধ্যে লাগামহীন দুর্নীতি, চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক হত্যা, পাল্টা হত্যা, কিছু বিতর্কিত আইন প্রনয়ণ, সমাজতন্ত্র ও সংবিধান প্রণয়ন, তিয়াত্তরের সাধারণ নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের প্রবল ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মুক্তিবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, মুজিব বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রভৃতি বাহিনীর দৌরাত্ম্য জনমনে প্রবল অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল। যে আশা-আকাঙ্খা নিয়ে মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তা প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের এই আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়ে সরকার দমন নীতি অনুসরণ করলে পরিস্থিতি আরো জটিলতর হয়ে পড়েছিল।

গবেষণার উদ্দেশ্যে সমূহ (Research Objectives): আমার গবেষণা পত্রটি যে সমস্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিচালিত হয়েছিল সেগুলো হলো-

১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝা।
২) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য পর্যালোচনা করা।
৩) পূর্ব পাকিস্থানের জনগনের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনার বিবরণ দেওয়া।
৪) বাংলাদেশের উত্থান ও তার সংবিধান প্রণয়ন সংবলিত ব্যাখ্যা প্রদান করা।
৫) শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ও কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন সমন্ধে পর্যালোচনা করা।

Research Gap: প্রশংসার পাশাপাশি শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ব্যবস্থা সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন করেছিলেন। এর মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল ও বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। সরকারি কর্মচারীদের বাকশালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এইভাবে বহুত্ববাদী ধ্যান ধারণার কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাকশালের চেয়ারম্যান। বাকশালের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী প্রায় সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা। গণতন্ত্রের পূজারী হয়েও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে গণতন্ত্রের মূলনীতি থেকে সরে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার এই একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতা সম্পর্কে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নতুন সংবিধান গ্রহণের সময় সংবিধানে জরুরি অবস্থা জারি করার কোন সংস্থান অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মুজিবুর রহমান জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এর মাধ্যমে তাঁর একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা বাংলাদেশ পেয়েছিল, এই স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিল না কমিউনিস্ট দলগুলি। কারণ হিসেবে তারা বলেছিল মুক্তি আন্দোলনে বিদেশী শক্তি ভারত সাহায্য করেছিল। স্বাধীনতার পর ভারত, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করেছিল শেখ মুজিবুর রহমান। তাই বাম মনোভাবাপন্ন দলগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের উপর কঠোর দমন চালিয়েছিল মুজিব প্রশাসন। এই বাম মনভাবাপান্ন দলগুলির প্রতি মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। মুজিবের শাসনে প্রবল অসন্তুষ্ট ছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও সরকারি আমলারা। সেনাবাহিনী অপেক্ষা প্যারামিলিটারিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আশা সরকারি আমলা ও সেনা আধিকারীকদের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, মাথাচাড়া দিয়েছিল সিন্ডিকেটরাজ ও মুক্তিবাহিনীর দৌরাত্ম্য। বহুল সমালোচিত শেখ মুজিবের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology): যে কোন সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতি বা Research Methodology খুব গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার কাজ করার আগে গবেষণাটি কিভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই গবেষণাটি মূলত বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক ও মুল্যায়নধর্মী প্রকৃতির। যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বনে এই গবেষণাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেগুলি হল- ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি। গবেষণাটি গৌন তথ্যসমূহের (Secondary Source) উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। Secondary Source

বা গৌন তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা, সরকারি পাবলিকেশন, আইন, আদালতের রায়, সরকারি-বেসরকারি তথ্য পরিসংখ্যান ও বিভিন্ন নথিপত্রের সাহায্যে গবেষণাটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

গবেষণাটি প্রতর্ক বিশ্লেষণের (discourse এনালাইসিস) ব্যাখ্যামূলক এবং গঠনবাদী পথ অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। প্রতর্ক বিশ্লেষণ হল ব্যাখ্যাবাদী কারণ এটি অনুমান করে যে "মানুষ বিশ্বাস, মূল্যবোধ বা মতাদর্শের ভিত্তিতে কাজ করে যা তাদের কর্মের অর্থ দেয় এবং রাজনৈতিক আচরণ বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে মানুষের বাহ্যিক ক্রীড়ার সাথে অর্থ সংযুক্ত হয়। ফলস্বরূপ, এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ঘটনা-প্রকৃতির গোপন অর্থ উদ্ঘাটিত করা যা রাজনীতির কুশীলবদের অংশগ্রহণ ও ভাষার সুক্ষ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে রাজনীতির ভাবার্থের প্রকাশ। কোন বিশ্বাস এবং ধারণাগুলি এই অর্থের জন্ম দেয় যা আপাত সম্পর্কহীন নানা ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করে? বক্তৃতা বিশ্লেষণ গঠনবাদী; এর উদ্দেশ্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া যে অর্থগুলি সামাজিকভাবে নির্মিত। উদাহরণস্বরূপ, 'জাতি পরিচিতির' কোনো প্রদত্ত অর্থ নেই। একটি রাষ্ট্রের জন্য জাতীয় আত্মপরিচিতি বলতে কী বোঝায় এবং এটিকে কীভাবে চিহ্নিত করা হয় তা প্রতর্ক নির্মাণের মধ্যে দিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই গবেষণায় এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষণার প্রশ্ন (Research Questions)

সামগ্রিক সাহিত্য পর্যালোচনা বা Literature Review থেকে এবং সমস্যার ভিত্তিতে বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল-

১) ভাষা আন্দোলন কি বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

২) ‘ছয় দফার’ ভুমিকা কি ছিল?

৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান জনগনের আশা-আকাঙ্খা কি পুরন করতে পেরেছিল?

৪) বাকশাল কি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল?

অধ্যায়সমূহ (Chapterization):আমার গবেষণার প্রস্তাবনায় (Research proposal) উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর অন্বেষণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল নিম্নলিখিত সাতটি অধ্যায়ের মাধ্যমে। অধ্যায়গুলো হলো -

প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনকে কিভাবে ব্যবহার করেছিলেন এই অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং মুক্তি আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিলেন সেটি এই অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর রাজনৈতিক বঞ্চনা কিভাবে মুক্তি যুদ্ধের সূচনা করেছিল এই বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গ বন্ধুর শাসন ব্যবস্থা ও শাসন তন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পেরেছিল সেই বিষয়টি এখানে আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী ও প্যারা-মিলিটারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যাক্তি স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও গনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রায় কেমন ছিলো সেই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়ঃ আমার গবেষণা পত্রের সঙ্গে অত্যন্ত গভীর সম্পর্কযুক্ত কতগুলি বিষয় প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। যেমন- ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ, শেখ মুজিবের সাড়ে তিন বছরের শাসনকাল। এছাড়াও সাহিত্য পর্যালোচনা, Research Gap, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার প্রশ্ন, গবেষণা পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এগুলির সাহায্যে আমার গবেষণা পত্র সম্পর্কে সার্বিকভাবে অবগত হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। ভারত বিভাগের সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তিনি যুক্তবাংলা গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাদের দাবি মেনে নেওয়া হয়নি, সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের। বাঙালি জাতি যাতে কোন অবস্থাতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতির প্রধান পরিচয় বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ শুরু করেছিল। তারা জোর করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে পূর্ব পাকিস্তানে দেখা দিয়েছিল ভাষা আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষা আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ফলে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও এই আন্দোলনের সমর্থনে কারা অভ্যন্তরেই অনশনে বসেছিলেন তিনি। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দিয়ে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ভাষা আন্দোলনকে তারা এক চরম পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের হাত ধরেই মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্ম হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তার প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা ছিল গগনচুম্বী। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেখা গেল মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের মতো প্রভাবশালী গণআন্দোলন সংঘটিত হতে দেখা যায়নি। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই আন্দোলনের সামনের সারির একজন সৈনিক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এবিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, বাঙালি জাতির প্রধান পরিচয় যেহেতু বাংলা ভাষা তাই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে সুরক্ষিত করার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। এই ভাবেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পথ প্রশস্ত করা সম্ভব। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে শাসকগোষ্ঠী যখনই বাংলা ভাষার উপর আঘাত করেছিল তখনই দেখা গেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

বাঙালি ছাত্র, যুব, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। অন্যভাবে বলা যায় বাঙালি ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখেরা ভাষা আন্দোলনকে তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি দিক থেকে বিবেচনা করত। এইগুলোর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ছিল আরো গভীরে। তিনি ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভাষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা হিসেবে প্রতিপন্ন করত। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এই মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রাখতে চায়। বঙ্গবন্ধু এটাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূলোচ্ছেদ না করতে পারলে বাঙালিদের ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক দিক থেকে ক্রমবিকশিত করে ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতিকে ভাষা ভিত্তিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। খুব সহজভাবে বলা যায় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করেছিলেন। যা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথম থেকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর আর্থ-সামাজিক নিপীড়ন শুরু করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ্য করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা আরও সুদৃঢ় ও স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী মরিয়া হয়ে উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ লুণ্ঠন করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রধানত এই সম্পদ ২২টি পরিবারের হাতে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। এই অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। দেখা যায় যে, ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি বাঙালি জাতিকে আর্থ-সামাজিক অধিকার সম্পর্কে আত্মসচেতন করার প্রয়াসও গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি, পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব পাকিস্তানের অংশগ্রহণ বেশি হওয়া প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই নীতি অনুসরণ করেনি। সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৮০-৯০ ভাগ লোক নিয়োগ করা হতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রবল বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করেছিল পাক সরকার। রাজস্বের ৭৫% সংগ্রহ করা হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে অথচ বাজেটের মাত্র ২৫% অর্থ বরাদ্দ করা হতো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। এছাড়াও শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর চাপিয়ে ছিল নতুন নতুন করের বোঝা। এই বৈষম্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষ ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম হয়ে পড়ে। ঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কোনোপ্রকার সহায়তা প্রদান থেকে বিরত ছিল সরকার।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আর্থ-সামাজিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছিল ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন, যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, বন্যা-খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিভিন্ন প্রকার কর বৃদ্ধি, নিরাপত্তাহীনতার অভাব, তাসখন্ড চুক্তি ইত্যাদি কারণে ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তান

দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে উদার হস্তে এগিয়ে আসেনি পাক সরকার। এই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠী বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হতে শুরু করেছিল। বাঙালি জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী দুরদর্শী রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার জনগণের এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শকে বাস্তবায়িত করার কাজে ব্যবহারের প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়, শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক বঞ্চনাজনিত তীব্র অসন্তোষকে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ গঠনের আন্দোলনে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বাঙালি জাতির চরম আর্থ-সামাজিক সংকটের সময়ে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির দলিল ছয়দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন। বাংলার জনমনে ছয় দফা প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে বলেছিলেন এটা আমাদের বাঁচার দাবি। ছয় দফা উত্থাপনের জন্য দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে কারারুদ্ধ করা হলে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠেছিল। আন্দোলনের চাপে রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছয় দফাকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে গ্রহণ করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সময় একটি প্রচারপত্র জনমনে প্রবল রেখাপাত করেছিল। প্রচারপত্রটির শিরোনাম ছিল 'সোনার বাংলা শ্মশান হইলো কেন!' এই প্রচারপত্রের সাহায্যে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার রূপ জনগণের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। দেখা যায়, জনগণ ছয় দফার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। ৭০- র সাধারণ নির্বাচনে জনতা আওয়ামী লীগকে উদারহস্তে ভোট দিয়েছিল। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল আওয়ামী লীগ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও, আওয়ামী লীগের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা না দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী কোনো ভাবেই বাঙালিদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দিতে রাজী ছিল না।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট বলেছিলেন ছয় দফার সঙ্গে কোন আপোষ করার অধিকার জনগণ আমাকে দেয়নি। অন্যভাবে বলা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছয় দফার বাস্তবায়নে ছিলন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্যদিকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ছয় দফার বাস্তবায়নের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাই দেখা যায় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ছয় দফাকে কেন্দ্র করে সংঘাত সর্বাত্মক আকার ধারণ করেছিল, সূচনা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের। নয় মাসব্যাপি ঐক্যবদ্ধভাবে দলমত নির্বিশেষে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল বাঙালি জাতি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাদের স্বপ্নের রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল বাঙালি জাতি।

অতএব দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে বাঙালি জাতিকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে সচেতন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার মানসিক শক্তি যুগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচীকে অতিক্রম করে বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তি, নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকড় উপড়ে ফেলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এটা বলা যায় যে, আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তি আন্দোলনে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলা গঠনের জন্য প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। শেখ মুজিবুর

রহমানকেও দেখা গিয়েছিল যুক্ত বাংলা গঠনের জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কাজ করতে। তাদের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের। পূর্ব বাংলার অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতি করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাঁকে করাচিবাসি হতে বাধ্য করা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান এই ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মুসলিম লীগ নেতাদের কোনঠাসা করতে শুরু করেছিল। জাল বোনা হচ্ছিল নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের।

পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে প্রগতিশীল ধারার জন্ম হয়েছিল, যার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন বাঙলার এক জনপ্রিয় মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাসিম। দেশ বিভাগের পর মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের একদল তরুণ ছাত্র নেতা ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটলিতে এসে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছিল। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, তাইজুদ্দিন আহমদ প্রমুখ। এই সমস্ত নেতারা প্রথমে যুব লীগ, তারপর ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেছিল। শাসকগোষ্ঠী এই সমস্ত রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের উপর কঠোর নির্যাতন নামিয়ে এনেছিল। দেখা যায় ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে ক্লান্তিহীন সংগ্রাম চালিয়েছিল এই তরুণ নেতারা।

এই সমস্ত তরুণ ছাত্র নেতারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে রাজনৈতিক নিপীড়ন চলছিল তার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে গেলে শক্তিশালী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা অত্যন্ত জরুরি। যে দল মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে একটি নতুন ধারার রাজনীতি উপহার দিতে সক্ষম হবে। এই ভাবনা থেকেই ১৯৪৯ সালে গড়ে তোলা হয়েছিল, আওয়ামী মুসলিম লীগ। প্রতিষ্ঠা লগ্নে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই নতুন দলের যুগ্ম সম্পাদক। এই দলকে একটি গণভিত্তিক দল হিসেবে তুলে ধরার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছিলেন। দ্রুত আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই দলকে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র প্রদানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদক হয়ে, আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দটিকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করেছিলেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেখা গিয়েছিল মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে আওয়ামী লীগ। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ব বাংলার জনগণ দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছিল যুক্তফ্রন্টকে। এই নির্বাচনে শেখ মুজিব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে যুক্তফ্রন্ট, সরকার গঠন করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। পরিতাপের বিষয় অগণতান্ত্রিকভাবে তিন মাসের মধ্যে এই সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। গ্রেফতার করা হয়েছিল শেখ মুজিবসহ বহু যুক্তফ্রন্ট নেতাকে। গণতন্ত্রকে পদদলিত করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ফেলে দেওয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছিল। তারা এই রাজনৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অত্যন্ত নগ্নভাবে রাজনৈতিক নিপীড়ন চালানো হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের উপর। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান গণতন্ত্রের মৌল নীতিগুলি পদদলিত করে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আইয়ুব খান সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করতে শুরু করেছিলেন। স্বৈরাচারী শাসন-শোষন চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তিনি বেশ কয়েকটি দমনমূলক আইন

প্রনয়ণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, শেখ মুজিবুর রহমানসহ পূর্ব পাকিস্তানের বহু রাজনৈতিক নেতাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। শুধু রাজনৈতিক নেতাই নয় অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাও নিস্তার পায়নি আইয়ুব খানের হাত থেকে। জেনারেল আইয়ুব খান তার শাসন-শোষন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে বিপজ্জনক এমন ব্যক্তিদের নির্বিচারে গ্রেফতার করেছিলেন। তাদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বিচার বিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের শাসনকালে পূর্ব পাকিস্তানে একটি শক্তিশালী গণআন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল যা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন পূর্ব পাকিস্তানে এই এতবড় শক্তিশালী আন্দোলন ১৯৬৯ সালের পূর্বে গড়ে উঠতে দেখা যায়নি। তৃণমূল স্তরের জনতা এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধ, তাসখন্দ চুক্তি পূর্ব পাকিস্তানে নিরাপত্তাহীনতার ভীতি সৃষ্টি করেছিল। এছাড়াও যুদ্ধজনিত ব্যায় নির্বাহ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের উপর বিভিন্ন প্রকার কর বৃদ্ধি করতে দেখা গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই দাবি প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কারণে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁকে কঠিন শাস্তি প্রদান করার উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আইয়ুব খানের রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছিল। যার ফলশ্রুতিতে দেখা দিয়েছিল তীব্র গণআন্দোলন। যত দিন যেতে থাকে ততই পূর্ব পাকিস্তানের উপর রাজনৈতিক নিপীড়ন তীব্রতর হতে শুরু করেছিল। বাঙালিরা এই রাজনৈতিক নিপীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে। আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সমাজ Democratic Action Committee (DAC) গঠন করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তৃণমূল স্তরের জনতা এই আন্দোলনে যোগ দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। DAC এগারো দফা দাবি উত্থাপন করলে জনমনে প্রবল আশার সঞ্চার ঘটেছিল।

DAC- এর এগারো দফা দাবির বাস্তবায়ন, সকল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত আসামির মুক্তি, পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক সংকটের নিরসন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা, সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করা, প্রশাসনের সংস্কার, শিক্ষার প্রসার ও সকল জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহারের দাবিতে ভয়-ভীতি, পুলিশের লাঠি-গুলি, কার্ফু ইত্যাদি উপেক্ষা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জনতা। আইয়ুব খান এই আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। বহু মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। হত্যা করা হয়েছিল অসংখ্য বাঙালি সন্তানকে। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে রাজপথ রক্ত আর মিটিং-মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়েছিল। প্রবল আন্দোলনের চাপে বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আইয়ুব খানেরও পতন ঘটেছিল। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলার বন্ধু বা বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হয়েছিল। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হয়েছিলেন।

আইয়ুব খানের পতনের পর তার সেনাপতি ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খানও কম স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন না। তার সময়েই পূর্ব পাকিস্তান সবথেকে বেশি রাজনৈতিক

নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রপতি হয়ে পাকিস্তানের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেছিলেন। এই নির্বাচনে ছয় দফাসহ একগুচ্ছ জনকল্যাণমূলক নির্বাচনী ইশতেহার দিয়ে ভোট প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিল আওয়ামী লীগ। এই নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে হতবাক করে দিয়ে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পরেছিল। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও আওয়ামী লীগ ও বাঙালিদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দিতে রাজি ছিলেন না ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তানের অবাঙালি নেতৃবৃন্দ। শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ইয়াহিয়া খান। যার ফলস্বরূপ মহম্মদ আলি জিন্নাহর স্বপ্নের পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল।

১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন মার্চ মাসের ৩ তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। খান সাহেবের এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেছিলেন ৩ তারিখের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে না, এটা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকবে। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। সাধারণ ধর্মঘট, মিছিল, আইন অমান্য ও সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার নীতি গ্রহন করেছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। পুলিশের লাঠি-গুলি উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল, তৈরি করা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসের দিনে গভর্নর হাউসের মতো কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোথাও উড়তে দেখা যায়নি পাকিস্তানের পতাকা। তাদের স্লোগান ছিল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন কর', "জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু" ইত্যাদি স্লোগানে বাংলাদেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে তখন মুজিবুর রহমানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানের জনপ্রশাসন পরিচালিত হচ্ছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ফলে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। বিদ্রোহের আগুন যখন জ্বলছে, সেই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ এই আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। মুক্তিকামি বাঙালি আন্দোলনের নতুন রসদ খুঁজে পেয়েছিল।

ইয়াহিয়া খান স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ এখন আর তার হাতে নেই। তাই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণহত্যা করার নির্দেশ দিয়ে টিক্কা খানকে গভর্নর জেনারেল করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছিলেন। ২৫ শে মার্চ ইতিহাসের এক কালো দিন, এই দিন পাকিস্তানি সেনারা শুরু করেছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। এই দিন রাতে পাকিস্তানের সেনা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরীহ মানুষের উপর। ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জারি করা হয়েছিল কারফিউ। অল্প বয়সী মেয়ে ও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে এমন যুবক ছিল তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। পাক বাহিনীর নির্বিচারে এই গণহত্যার ফলে ঢাকা রক্তের নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

অপারেশন সার্চলাইটের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি কমান্ডো দল এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল। আগেই খবর পেয়ে তিনি তাঁর দলের সব নেতাকে সরে যাবার নির্দেশ দিয়ে নিজে বসে ছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে।

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বাঙালি জাতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারা হৃদয়ে ধারণ করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের জীবন তুচ্ছ করে স্বাধীনতার জন্য তীব্র সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই আন্দোলন

দুর্বল করার উদ্দেশ্যে পাক সেনা, রাজাকার ও আলবাদর প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল। পাক বাহিনীর আক্রমণ যত তীব্র হয়েছিল, বাঙালিদের প্রতিরোধও ততই তীব্রতর হতে দেখা গিয়েছিল। তারা গড়ে তুলেছি মুক্তি বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী ও মুজিব বাহিনীর মতো বিভিন্ন প্রতিরোধ বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য দলে দলে বাঙালি যুবকরা এই সমস্ত বাহিনীতে যোগ দিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রবাসী মুজিবনগর সরকার। যার কার্যালয় ছিল কলকাতায়।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল। এই সময় ভারতও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনা পাক সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে পাক বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকসেনা বাধ্য হয়েছিল যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে। এই ঘটনার মধ্য দিয়েই তিরিশ লক্ষ্য শহীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকলেও প্রত্যক্ষ কারণ ছিল রাজনৈতিক বঞ্চনা। এই রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিদের রুখে দাঁড়ানোর সাহস ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। অন্যভাবে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যিনি বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিক দিক থেকে আত্মসচেতন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই দেখা যায় রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিপাগল বাঙালি স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নয়নের মনি শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ শেখ মুজিবুর রহমানকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। তিনিই হয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি হিসেবে দাবি করে আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা সুনজরে দেখেনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ঐক্যবদ্ধ লড়াই। স্বাধীনতার পর একটি জাতীয় সরকারের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে আওয়ামী লীগ সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। এরফলে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়াও যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা নিজের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করা হয়নি। এরফলে মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল চরম অসন্তোষ। এই পরিবেশ জাতি গঠনের পক্ষে সহায়ক ছিল না। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রক্ষীবাহিনী গঠন করে তাদের জাতীয় অগ্রগতির কাজে ব্যবহারের প্রচেষ্টা সরকার গ্রহণ করলেও খুব বেশি সাফল্য অর্জন করা যায়নি। দ্রুত এই বাহিনী জনমনে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থিত করার বিশেষ বাহিনী হিসেবে জনমনে পরিচিতি লাভ করেছিল।

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে তাৎক্ষনিকভাবে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলো হলোঃ (১) প্রশাসন সুষমকরণ; (২) ভারত প্রত্যাগত প্রায় এককোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন; (৩) আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য সশস্ত্র লোকদের নিয়ন্ত্রণ; (৪) যুদ্ধকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, সেতু এবং রেলসড়কের মেরামত; এবং (৫) জাতীয় অর্থনীতি, বিশেষ করে শিল্প এবং অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল করে তোলা। এছাড়াও বেশ কয়েকটি কারণে জরুরী ভিত্তিতে

সমাধানযোগ্য যে কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিলো সেগুলো হলো: (ক) বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থিতি; (খ) সীমান্তে চোরাচালান; (গ) যুদ্ধকালীন সময়ে পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছিলো এমন দালালদের উপস্থিতি; এবং (ঘ) যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত সমস্যা। এছাড়া বাংলাদেশে আটকে পড়া বিহারী অবাঙালী এবং পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালীদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসবের পাশাপাশি, সংগ্রামে সফলতা আসার পর দেশের জনগণের আচার আচরণে গগনচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছিলো। স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিবের দায়িত্ব ছিলো দেশের প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তাঁর দীর্ঘ লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলার বাস্তব রূপায়ন।

স্বাধীনতার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ জনগনকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, জনগণ যে আশায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য শেখ সাহেবের সরকার একগুচ্ছ আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। যেমন- পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরন আইন, ব্যাঙ্ক ও বীমা সংস্থার জাতীয়করণ, ত্রান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, পরিকল্পনা কমিশন ও পাঠশালা পরিকল্পনা, জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন, দালাল আইন ইত্যাদি একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় এই সমস্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো ছিল না। এছাড়াও আওয়ামী লীগ ছিল পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সামর্থ্যও ছিল না। এই সমস্ত কর্মসূচির মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাই ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। জনগণ ক্রমশ দরিদ্রতম হয়ে পড়েছিল। ১৯৭৪ সালে দেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। খাদ্যের অভাবে ১৫ লক্ষ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে সরকারকে সতর্ক করা হলেও আত্মবিশ্বাসী শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। সরকার এই প্রচার করতে থাকে যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে তারা সক্ষম হবেন। এবিষয়েও আওয়ামী লীগ অবগত ছিল যে, খাদ্যের সংকট বাংলাদেশে নতুন কোনো সমস্যা নয়। জনসংখ্যার অনুপাতে এদেশে খাদ্য উৎপাদন হয়না। তার উপর খুন, ধর্ষণ, লুটপাট ইত্যাদি পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছিল। খুব সহজভাবে বলা যায় দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, চোরাচালান মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবস্থা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারী শাসনের থেকেও নিকৃষ্টতর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে আওয়ামী লীগের পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রবনতা ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। ত্রান বন্টন কর্মসূচি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরন আইন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইন ইত্যাদি মহান কর্মসূচি গুলির মাধ্যমে লাভবান হয়েছিল আওয়ামী লীগ। পরিস্থিতি এতই সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায় যে, আওয়ামী লীগ নেতাদের পাহাড় সমান দুর্নীতি দলের অভ্যন্তরেই সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল।

আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচিও ছিল। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিরুদ্ধ মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্মূল করা। এই কাজে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে ব্যবহার করেছিল। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী ছিল অত্যন্ত দূর্বল। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হত না। আমলাতন্ত্রের উপর ছিল রাজনৈতিক এলিটদের আধিপত্য। দালাল আইনের সাহায্যে হতদরিদ্র মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের হয়রানি করা হতো তাদের গায়ে দালাল তকমা লাগিয়ে দিয়ে। মুজিব বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, রক্ষীবাহিনী, লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইত্যাদি বাহিনীর কার্যকলাপে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। নতুন সংবিধান অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের যে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই নির্বাচনকে একপ্রকার প্রহসনে পরিণত

করেছিল আওয়ামী লীগ ও শেখ সাহেবের সরকার। এক পর্যায়ে কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার জয় সুনিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজেই নির্বাচনী ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ উঠেছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান পূর্বে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক বর্গের সার্বিক মুক্তির জন্য একটি প্রগতিশীল সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। এই সংবিধানে কতগুলো প্রগতিশীল আদর্শ লিপিবদ্ধও করা হয়েছিল। যেমন- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাধারণতন্ত্র। পাশাপাশি নাগরিকবর্গের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য কতগুলো মৌলিক অধিকারও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই সংবিধান সবথেকে বেশি প্রসংশা অর্জন করেছিল এই কারণে যে, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর যে সংবিধান গৃহীত হয়, সেই সংবিধানে রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা লিপিবদ্ধ ছিল না। এছাড়াও নিবর্তনমূলক আটক আইন জারি করার ক্ষমতাও পার্লামেন্টের ছিল না। পরিতাপের বিষয়, এই প্রগতিশীলতা তারা পরবর্তী সময়ে ধরে রাখতে পারেনি। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে এই দুটি বিষয় তারা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করেছিল। দেশে জরুরি অবস্থাও জারি করা হয়েছিল। নিবর্তনমূলক আটক আইনের সাহায্যে অগণতান্ত্রিকভাবে বহু রাজনৈতিক নেতাকে আটক করাও হয়েছিল। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপরেও শুরু হয়েছিল অবাঞ্ছিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। যেগুলো পূর্বে দেওয়া আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন ব্যবস্থার একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হল ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন। এর মাধ্যমে বাকশাল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সরকারি কর্মচারী ও সংসদ সদস্যদের বাকশালে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কয়েকজন আওয়ামী লীগ সাংসদ বাকশালে যোগদান করতে অস্বীকার করলে তাদের সাংসদ পদ বাতিল করা হয়েছিল। সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছিল এক ব্যক্তির হাতে। বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। শেখ সাহেব সারাজীবন যে উচ্চ গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুশীলন করেছিলেন সেই আদর্শকেই নিজের হাতে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। শেখ মুজিব এটিকে দ্বিতীয় বিপ্লব বলেছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ হিসেবেও বাকশাল ব্যবস্থাকে গণ্য করেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের শ্রেণিচরিত্র সমাজতন্ত্র নির্মানের উপযোগী ছিল না। এটা ছিল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক রণকৌশল মাত্র। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে সমস্ত সেনা অফিসারদের হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন সেই সমস্ত অফিসাররা দাবি করেন যে, সেনাবাহিনী ও কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই তারা এই বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির জন্য যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে মুক্তি আন্দোলনে জনগণকে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার খুব কম ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করেছিল। বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছিল। জনমনে নেমে এসেছিল চরম হতাশা। আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের ভাবমূর্তিও প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তিক্ত সম্পর্ক নতুন কোন বিষয় ছিল না। এর সূচনা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের পরেই। আওয়ামী লীগ ভারতের সহায়তায় স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল। আওয়ামী লীগের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিরোধী কয়েকটি রাজনৈতিক দল প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিল। এই দলগুলি ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এটা মেনে নিতে পারেনি। স্বাধীনতার পর একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে আওয়ামী লীগ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। এছাড়াও আওয়ামী লীগের বেশকিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। খুব সহজভাবে বলা যায়, স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি হিসেবে দাবি করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি মেনে নিতে পারেনি। এরফলে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভীতি প্রদর্শন, হত্যা-পাল্টা হত্যা, মতপার্থক্য সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। অন্যভাবে বলা যায়, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে যতবেশি তৎপর হয়েছিল, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিরোধও তত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি যোদ্ধাদের নিয়ে প্যারামিলিটারি গঠন করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মুক্তি যোদ্ধাদের দেশের কাজে লাগানো, আইন-শৃঙ্খলা ও চোরাচালান রোধে পুলিশ ও মিলিটারিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। তাই শেখ মুজিব বৃহৎ সেনাবাহিনী গঠনে আগ্রহ দেখাননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশপ্রেমিকদের নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন রক্ষীবাহিনী ছিল রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। তাই বিভিন্ন সময় সরকারের আহ্বানে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহায়তা প্রদান করতে গিয়ে রক্ষীবাহিনীকে বিরোধী দলগুলির কাছে বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে রক্ষীবাহিনী যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল তা খাটো করে দেখা হতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, রক্ষীবাহিনী বিরোধী দলগুলির কাছে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থিত করার এক বিশেষ বাহিনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করে মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা যথেষ্ট কঠিন ছিল। এই অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন, নেতা সরকারের ব্যর্থতাগুলিকে হাতিয়ার করে স্বাধীন বাংলাদেশে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থিত করার লক্ষ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। যেটা সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের পক্ষে ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান কোন শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনে আগ্রহ দেখাননি। তিনি মনে করতেন সেনাবাহিনীর জন্য ব্যাপক অর্থ খরচ না করে সেই অর্থ জাতির কল্যাণে ব্যবহার করা শ্রেয়। এছাড়াও তিনি ভারত কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন শক্তিশালী সেনাবাহিনী কিভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল। শেখ মুজিবের এই অভিজ্ঞতা শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে তাঁকে অনাগ্রহী করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন দেশের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হিসেবে জনগনকে তুলে ধরতে। শেখ মুজিবুর রহমানের সেনাবাহিনীর প্রতি এই রকম মনোভাব সেনাবাহিনীর এক অংশের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে এই রকম মনোভাব

দেখা যাচ্ছিল যে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি সেনা অফিসাররা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হচ্ছে না।

আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে একগুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় এই প্রগতিশীলতা তাদের পক্ষে ধরে রাখা আর সম্ভব হয়নি। দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট, বিরোধী দলগুলির হঠকারী আন্দোলন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, মুদ্রাস্ফীতি, চোরাচালান ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠলে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছিল। এটা ছিল স্বাধীনতার পূর্বে আওয়ামী লীগের ঘোষিত নীতি ও প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে চরম অগণতান্ত্রিক এই নীতি স্বাধীন বাংলাদেশে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন শেখ মুজিব।

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে শক্তিশালী আমলাতন্ত্র দেখে স্বাধীন বাংলাদেশে এইরূপ আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কয়েকজন আমলা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছিল। যার ফল হয়েছিল মারাত্মক। এই অবস্থায় স্বাধীন বাংলাদেশে শক্তিশালী আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হলে দেশের জন্য তা মঙ্গলজনক হবে না বলে শেখ মুজিবুর মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন আমলাতন্ত্রের উপর রাজনৈতিক এলিটদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি আমলাতন্ত্রকে ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারনা পরিত্যাগ করে আমলাদের জনগনের সেবক হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমলাতন্ত্র সম্পর্কে শেখ মুজিবের এই মনোভাব সেনাবাহিনীর মতো আমলাদের মধ্যেও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পূজারী। গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই করেছিলেন তিনি। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। শুধু তাই নয় এক বছরের মধ্যে একটি সংবিধান উপহার ও সংবিধান কার্যকর হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উৎসব সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। পরিতাপের বিষয় মহান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পূজারী হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে উদ্ভূত সংকটের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিসর্জন দিয়ে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের এই পরিবর্তন বিভিন্ন মহল থেকে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিল।

নবগঠিত বাংলাদেশে মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা খুব কম ক্ষেত্রেই সাফল্যের মুখ দেখেছিল। সমাজতন্ত্র বাস্তবায়িত করতে গেলে আওয়ামী লীগের মধ্যে যে প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার প্রয়োজন ছিল আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা কর্মীর তা ছিল না। তাই দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষনের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়নি। দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের বহু নেতা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছিল।

এই অবস্থায় কতগুলো রাজনৈতিক দল যারা ছিল সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সমর্থক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতাকে হাতিয়ার করে সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করে তুলেছিল।

পাশাপাশি তারা আওয়ামী লীগের শাসনকালে জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে দায়ি করেছিল। এক অংশের জনতা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিল। এই অবস্থায় দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন শেখ মুজিব।

শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হঠকারী আন্দোলন প্রতিহত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি চতুর্থ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাকশাল ব্যবস্থা চালু করার পথ সুনিশ্চিত করেছিলেন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির অবসান ঘটিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবর্তন করা। এইজন্য তিনি শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটিমাত্র জাতীয় দল শ্রমিক কৃষক আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন করা হয়েছিল। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর কঠোরভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। শাসনব্যবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছিল। সংসদীয় ব্যবস্থা দুর্বল করে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত ক্ষমতা একব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির হাতে কুক্ষিগত হয়েছিল। খুব সহজভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিত্যাগ করে একটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। বাকশালকে শেখ মুজিব দ্বিতীয় বিপ্লব বলেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বাকশাল কোনো বিপ্লব ছিল না। এটা ছিল আওয়ামী লীগের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার একটা কৌশল মাত্র। অধিকাংশ বাকশালের পদাধিকারী ছিলেন আওয়ামী লীগের। এরাই ছিল শেখ মুজিবের পুরোনো মন্ত্রীসভার সদস্য। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে বিরাজমান ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি শক্তহাতে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিব। বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিচার বিভাগ ও প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ চেয়েছিলেন। জনগণের ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রান্তিক জনগণের কাছে বিচার ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি সমবায় ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। উৎপাদনে গতি এনে বাংলাদেশকে আত্মনির্ভর করা ছিল বাকশালের একটি অন্যতম লক্ষ্য। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় রাষ্ট্র ক্ষমতাকে এক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত করা হলেও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনাও বাকশাল ব্যবস্থায় বলা হয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ব্যবস্থা কার্যকর করতে চেয়েছিলেন জনগণের সম্মতির ভিত্তিতেই। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন কোনো সংকীর্ণ স্বার্থে শেখ মুজিব বাকশাল ব্যবস্থা চালু করেছিলেন বিষয়টি এমন নয়। তিনি চেয়েছিলেন হতদরিদ্র মানুষের সার্বিক মুক্তি। শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন প্রচলিত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে এটা সম্ভব ছিল না। এছাড়াও যে আওয়ামী লীগকে তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন সেই আওয়ামী লীগ দলটিও উদ্ভূত সংকটের মোকাবিলা করতে অপারগ বলে শেখ মুজিব মনে করেছিলেন। তাই তিনি সকল পেশা, সকল শ্রেণির মানুষকে নিয়ে একটি গণভিত্তিক জাতীয় দল গড়ে তুলেছিলেন।

নবগঠিত বাংলাদেশে উদ্ভূত সমস্যা গুলির সমাধানের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার ও শেখ মুজিবুর রহমানের দক্ষতা, বিচক্ষণতা, দুরদর্শিতা ও অনেক বেশি সহনশীলতার প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যদি নিজেদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করত তাহলে বিশ্বে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হত।

পরিতাপের বিষয় হল শাসকদল ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে এগুলির অভাব জাতির জন্য বয়ে আনে এক ভয়াবহ সংকট।

সপ্তম অধ্যায়ঃ আমার গবেষণা প্রস্তাবে যে চারটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলির উত্তর অন্বেষণ করা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। যথা -

১) ভাষা আন্দোলনকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ভাষা আন্দোলনকে ক্রমবিকশিত করে ভাষা ভিত্তিক স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভাষা আন্দোলনকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২) শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার ভূমিকা কী ছিল? এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে যে, ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক মুক্তির দলিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে ছয় দফাকে একদফা অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান জনগনের আশা-আকাঙ্খা কি পূরন করতে পেরেছিল? এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

৪) শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল ব্যবস্থা কি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, বাকশাল কোনো বিপ্লব ছিল না। এটা ছিল শাসনব্যবস্থার নাম পরিবর্তন মাত্র। শাসক ও শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বাকশাল ব্যবস্থার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।

গবেষণা প্রশ্নের উত্তর সমূহ (Answers of Research Questions):

১) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা বিরল প্রকৃতির ভূখণ্ড নিয়ে ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল এটা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন যুক্তবাংলা। তাদের এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাকে পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রথম থেকেই বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ শুরু করেছিল শাসকগোষ্ঠী। ভাষা কোনো একটি জাতির শুধু মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট জাতির সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও গভীর ভাবাবেগ। বাঙালিদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৯৪৮ সালে শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠেছিল। এই আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন। তার দাবি উপেক্ষা করা হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী দাবি করেছিল যে, বাংলা আসলে হিন্দুদের ভাষা। পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, তাই উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ধীরেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল। গঠন করা হয়েছিল রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। দলে দলে বাঙালি ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক এই ভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

বাঙালিরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তা ছিল আরও গভীরে। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বাঙালি

জাতির আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাকে ধুলিসাৎ করার এক জঘন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে চলেছে শাসকগোষ্ঠী। তাই তিনি এই আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বাংলার দামাল ছেলেরা আন্দোলন চালিয়েছিল। পুলিশ এই আন্দোলন দমন করতে অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনকারীদের উপর বিনা প্ররোচনায় লাঠি চালিয়েছিল। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল কাঁদানি গ্যাস, চালানো হয়েছিল ব্যাপক ধরপাকড়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু আন্দোলনকারীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কঠোর দমননীতি অনুসরণ করেও এই আন্দোলন দমন করা যায়নি। পক্ষান্তরে শাসকগোষ্ঠী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল আন্দোলনের প্রবল চাপে। খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার নিঃশর্তে আন্দোলনকারীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আন্দোলনকারীদের আট দফা দাবিও মেনে নেওয়া হয়েছিল। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, বাংলা ভাষাকে দুর্বল করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতাকে জিয়িয়ে রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল পাক সরকার। তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করতে না পারলে স্বাধীন সার্বভৌম ভাষা ভিত্তিক বাংলাদেশ সৃষ্টি সম্ভব হবে না। তাই তিনি ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উন্নীত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলন তীব্র গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। এইদিন পুলিশের গুলিতে বেশকয়েকজন আন্দোলনকারী যুবক শহীদ হয়েছিলেন। ব্যাপক অত্যাচার করা হয়েছিল ভাষা পাগল বাঙালি ছাত্র-যুবকদের উপর। বাংলার দামাল ছেলেরা ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ী। বাহান্নর এই ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করেছিল, সেই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর নগ্ন চেহারা প্রকাশ্যে এসেছিল।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কারাগারে। তার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তিনি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অন্তরালে থেকে। দেখা যায় অসুস্থতার ভান করে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেছিলেন শেখ মুজিব। তিনি চিরকুটের সাহায্যে নির্দেশ পাঠাতেন। আন্দোলনকারীদের সমর্থনে কারা অভ্যন্তরে আমরণ অনশনে বসতে দেখা যায় শেখ মুজিবকে। এ থেকেই বোঝা যায় ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করতে শেখ মুজিবের প্রবল আকুতি ছিল।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাংলা ভাষার উপর নগ্নভাবে আক্রমণ শুরু করেছিল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, বাংলা হিন্দুদের ভাষা। তাই উর্দুর ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ, পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র, তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথকে তারা হিন্দুদের কবি হিসেবে গণ্য করত। বাঙালির প্রাণের উৎসব ১লা বৈশাখ উদযাপন না করার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। উস্কানি দেওয়া হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতাকে। তারা মনে করতেন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পঙ্গু করা সম্ভব।

ভাষা আন্দোলনকে দমন করার জন্য কঠোর দমননীতি গ্রহণ করার পরও এই আন্দোলন দমিয়ে রাখা যায়নি। আন্দোলনকারীদের প্রবল চাপে ১৯৪৮ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন আটদফা দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বাংলা ভাষার সংস্কার করে উর্দুর প্রভাব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। খুব সহজভাবে বলা যায় ভাষা আন্দোলন

শাসকগোষ্ঠীকে যেমন ভীতসন্ত্রস্ত করেছিল। অন্যদিকে বাঙালি জাতির আত্মপ্রত্যয় ও মনোবল বৃদ্ধি করেছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ভাষা আন্দোলনকে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭১ সালে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির নয় মাসব্যাপি লড়াইয়ের অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস ছিল ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ক্রমশ বিকশিত করেছিল। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব না থাকলে বিশ্ব মানচিত্রে বাঙালি জাতির অস্তিত্বও বিপন্ন হতো। অতএব দেখা যায় যে, ভাষা আন্দোলনকে সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে দেখতেন, শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলনকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমবিকশিত করে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই বিশ্ব মানচিত্রে একটি ভাষা ভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। শুধু তাই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বাঙলাদেশকে একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই ছিলেন একমাত্র রাষ্ট্রনেতা যিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বাংলা ভাষাকে গৌরবান্বিত করেছিলেন।

২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। পরিতাপের বিষয় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সূচনা করেছিল। এর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি, পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব পাকিস্তানের অংশগ্রহণ বেশি হওয়া প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই নীতি অনুসরণ করেনি। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মতো বিভিন্ন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৮০-৯০ ভাগ লোক নিয়োগ করা হতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসা- বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রবল বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করেছিল পাক সরকার। রাজস্বের ৭৫% সংগ্রহ করা হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে অথচ বাজেটের মাত্র ২৫% অর্থ বরাদ্দ করা হতো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। এছাড়াও শাসকগোষ্ঠী চাপিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের উপর নতুন নতুন করের বোঝা। এই বৈষম্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছিল। মানুষ ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম হয়ে পড়েছিল।

বাঙালি জাতির চরম আর্থ-সামাজিক সংকটের সময়ে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির দলিল ছয়দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন। বাংলার জনমনে ছয় দফা প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে বলেছিলেন এটা আমাদের বাঁচার দাবি। ছয় দফা প্রচারের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত জনসভার আহ্বান করেছিলেন সেই সভাগুলোতে হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ এসে যোগ দিয়েছিল। ছয় দফা উত্থাপনের জন্য দেশোদ্রোহিতার অভিযোগে বঙ্গবন্ধুকে কারারুদ্ধ করা হলে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠেছিল। আন্দোলনের চাপে রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছয় দফাকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে গ্রহণ করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল। দেখা যায়, জনগণ ছয় দফার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। ৭০- র সাধারণ

নির্বাচনে জনতা আওয়ামী লীগকে উদারহস্তে ভোট দিয়েছিল, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল আওয়ামী লীগ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও, আওয়ামী লীগের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা না দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী কোনো ভাবেই বাঙালিদের রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দিতে রাজী ছিল না।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট বলেছিলেন ছয় দফার সঙ্গে কোন আপোষ করার অধিকার জনগণ আমাকে দেয়নি। অন্যভাবে বলা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছয় দফার বাস্তবায়নে ছিলন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্যদিকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ছয় দফার বাস্তবায়নের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাই দেখা যায় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ছয় দফাকে কেন্দ্র করে সংঘাত সর্বাত্মক আকার ধারণ করেছিল, সূচনা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের। নয় মাসব্যাপি ঐক্যবদ্ধভাবে দলমত নির্বিশেষে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল বাঙালি জাতি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাদের স্বপ্নের রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ।

অতএব দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে বাঙালি জাতিকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে সচেতন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার মানসিক শক্তি যুগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবিকে অতিক্রম করে বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তি, নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকড় উপড়ে ফেলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। তাই এই কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে যে সমস্ত উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী।

৩) পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি সংবিধানের দাবি জানিয়ে আসছিল, যে সংবিধান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি দিতে পারে। ১৯৭১ সালে যে আশা-আকাঙ্খা নিয়ে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার মধ্যে একটি প্রগতিশীল সংবিধানের দাবিও ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে আওয়ামী লীগ জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা একটি প্রগতিশীল সংবিধান উপহার দেবে। তাই স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক ভাবেই এই গুরু দায়িত্ব আওয়ামী লীগের হাতে চলে।

শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগ প্রত্যক্ষভাবে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও যুদ্ধ শেষে এই দল নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শক্তি হিসেবে দাবি করেছিল ও স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠন করেছিল। কয়েকটি রাজনৈতিক দল একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানালে সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেই সংবিধানকে অত্যন্ত প্রগতিশীল সংবিধান হিসেবে দাবি করেছিল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ বলেছিল যে, তারা একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে ও জনগণের সার্বিক মুক্তি দিতে পারে এমন একটি সংবিধানও প্রনয়ন করা হয়েছে।

গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, প্রগতিশীল সংবিধান প্রণয়ন করা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, এই দলটি ছিল উদীয়মান পেটি বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। প্রকৃতপ্রস্তাবে আওয়ামী লীগের পূর্বে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ছিল আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের আস্থা অক্ষুন্ন রাখার কৌশল মাত্র। বাংলাদেশের সংবিধান চারটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেগুলো হলো- জাতীয়তাবাদ,

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই আদর্শগুলি মহান হলেও এগুলো বাস্তবায়নের আন্তরিকতা ও রাজনৈতিক সক্ষমতা আওয়ামী লীগের ছিল না। এছাড়াও এগুলি বাস্তবায়ন করতে গেলে দেশের অভ্যন্তরে যে পরিবেশের প্রয়োজন সে সম্পর্কে আওয়ামী লীগ ভাবিত ছিল না।

সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক কোনো সংঘাত না থাকলেও পরস্পরের সম্পর্ক বেশ জটিল। এই দুটি আদর্শ একসঙ্গে বাস্তবায়িত করা কার্যত বেশ কঠিন। পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র উপস্থিত করেছিলেন। বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে একসঙ্গে বাস্তবায়িত করার ফলাফল কার্যত কাল্পনিক চিত্রাঙ্কন ছাড়া আর কিছুই নয়। সংবিধানের এই চারটি নীতি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য ছিল না, এগুলি কতটা বাস্তবায়িত করা হবে আর কতটা বাস্তবায়িত করা হবে না, তা ছিল সরকারের স্বেচ্ছাধীন বিষয়। বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল। পরিতাপের বিষয় আওয়ামী লীগ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজ দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার উপর গুরুত্ব দিয়েছিল। ফলস্বরূপ একটি শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি বাংলাদেশ।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে আওয়ামীলীগ কতটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিল, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে আওয়ামী লীগের মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শোনা যায়নি। বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের চাপেই শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাই দেখা যায় অন্য তিনটি সংবিধানের মৌল নীতির মতো ধর্মনিরপেক্ষতাও সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। বাংলাদেশকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে মনে করতে পারেনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ OIC(Organization of Islamic Cooperation)-র সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে যে সংবিধান অনুমোদিত হয়েছিল, সেই সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক আইন ও রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা জারি করার ক্ষমতা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই কারণে, এই সংবিধানটি বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রগতিশীলতার মর্যাদালাভ করেছিল। পরবর্তী সময়ে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে এই দুটি বিষয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ সংবিধানে উল্লিখিত নাগরিক অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এছাড়াও সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের উদাসীন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। যার ফলে সংবিধানে উল্লেখিত নাগরিক বর্গের আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করার ক্ষেত্রে নাগরিকরা বঞ্চিত হয়েছিল। মৌলিক অধিকারের উপর রাষ্ট্র অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করেছিল। সহজভাবে বলা যায় সংবিধান গ্রহণের সময় সংবিধানের যে প্রগতিশীল প্রকৃতি ছিল, ধীরে ধীরে তা বিনষ্ট করবার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল।

সংবিধানে প্রগতিশীলতা যতটুকু ছিল তার উপর আঘাত করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। এই সংশোধনীতে বাকশাল ব্যবস্থা গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। এর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। যাবতীয় রাষ্ট্র ক্ষমতা চলে গিয়েছিল এক ব্যক্তির হাতে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। শেখ সাহেব নিজেই হয়েছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। সরকারি কর্মচারী, সংসদ সদস্যদের বাকশালে যোগদান বাধ্যতামূলক করা

হয়েছিল। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। বিচারবিভাগ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ একটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

উপরের আলোচনা থেকে যে বিষয়টি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার সেটি হল স্বাধীনতার পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছিল। তাই দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা স্বৈরাচারী পাক শাসকবর্গের শাসনব্যবস্থাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল।

৪) তীব্র আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটের সময়, যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশের শাসনভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে শেখ সাহেব বলেছিলেন, আমাকে তিন বছর সময় দিন, এই সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করবো। এদেশে অশিক্ষা, দারিদ্র্য থাকবে না, না খেতে পেয়ে মানুষ মরবে না। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে। ১৯৭৪ সাল ছিল বঙ্গবন্ধুর তিন বছর সময়ের শেষ বছর।

দেখা গেল তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সংকট থেকে বাংলাদেশকে মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার। অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছিল। খুন-সন্ত্রাস, লুটপাট, রাহাজানি, সিন্ডিকেটরাজ, সরকারি আমলা, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মারাত্মকভাবে দূর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পরেছিল। স্বজনপ্রীতি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অবস্থায় জনগণের দুঃখ-দুর্দশা মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বামপন্থী দলগুলো সশস্ত্র আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও খুব বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। শেখ সাহেবকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কয়েকবার সেনাবাহিনী তলব করতে দেখা গিয়েছিল। দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাদের প্রকাশ্যে কড়াভাবে সমালোচনা করতেও কার্পন্য করেননি শেখ মুজিব।

সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করার উদ্দেশ্যে সরকার অগণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। ১৯৭৩ সালে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রনয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিচার ছাড়াই দীর্ঘদিন আটক রাখার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। এছাড়াও রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা তুলে দিয়ে নাগরিক বর্গকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে পাকাপোক্ত করা হয়েছিল। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করা। অগণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে শেখ সাহেব ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই কারণেই শেখ মুজিবুর রহমানকে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি দিনটি ছিল বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই দিনেই সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইন পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের এক অংশের নেতা, দেশের জনগণ, বিরোধী রাজনৈতিক দলের দাবি উপেক্ষা করে শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। এর ফলে সংবিধানের গণপ্রজাতান্ত্রিক প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত করে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।

সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র জাতীয় দল হিসেবে বাকশালকে ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকারি কর্মচারী ও সংসদ সদস্যদের বাকশালে বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। আইনসভাকে দুর্বল করে দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে একমাত্র ক্ষমতার উৎস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছিল এক ব্যক্তির হাতে। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশ একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।

উপরের আলোচনা থেকে দৃঢ়চিত্তে এটা বলা যায় যে, বাকশাল ব্যবস্থাকে শেখ মুজিবুর দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে ঘোষণা খরলেও বাকশাল কোন বিপ্লব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আওয়ামী লীগের চিরস্থায়ী ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকার একটি কৌশল মাত্র। বাকশাল ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, বাকশালের গুরুত্বপূর্ণ পদাধীকারী প্রায় সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই ছিলেন বাকশালের চেয়ারম্যান। বাকশালের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতিক নৌকাকে। বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের বাকশালের গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন জায়গা ছিল না। প্রকৃতপ্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সরকারের চরম ব্যর্থতাকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে শাসনব্যবস্থার শুধুমাত্র নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। অগণতান্ত্রিক শাসন অব্যাহত ছিল। আওয়ামী লীগের পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি আড়াল করে বাকশালকে একমাত্র জাতীয় দল হিসেবে ঘোষণা করে সকলকে বাকশালের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের দলীয় শাসন অক্ষুন্ন রাখার এক নীল নকশা ছিল বাকশাল।

শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। এর মাধ্যমে যারা সত্যিকারের সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করছিলেন তাদের প্রতিহত করা ছিল এর উদ্দেশ্য। পাশাপাশি শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় সমিতি গঠনের উপর জোর দিয়েছিলেনন। কৃষকের জমির মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে উৎপাদিত ফসল তিনভাগে বিভক্ত করে দুই ভাগ সমবায় সমিতিকে প্রদান করার কথা বলা হয়েছিল। একভাগ সংশ্লিষ্ট কৃষককে রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল যে অধিকাংশ কৃষক সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করেননি। কারণ তারা এটা বুঝতে পেরেছিলেন সরকারি সকল আর্থ-সামাজিক সুফল প্রায় সবটাই ভোগ করছে আওয়ামী লীগ। খুব সহজভাবে বলা যায়, বাকশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের যে মডেল উপস্থিত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান তা জনগণ গ্রহণ করেনি। মেনে নেয়নি বাকশাল ব্যবস্থাকে দ্বিতীয় বিপ্লব হিসেবে।

মন্তব্যঃ শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল ব্যবস্থার সূচনা করেন ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে। এই বছরেই ১৫ আগস্ট তিনি নিহত হন। তার মৃত্যুর পর বাকশাল ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়। এই অবস্থায় বাকশাল ব্যবস্থার সাফল্য, ব্যর্থতা, এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছান সহজ কাজ নয়। এছাড়াও বাকশাল ব্যবস্থা চালু করার পূর্বে কোনো স্বচ্ছ তাত্বিক ব্যাখ্যা ও পরিকল্পনা সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়নি। এই অবস্থায় বাকশাল সম্পর্কিত তথ্য, পরিসংখ্যান, প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও নথিপত্রের যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। নতুন গবেষকের দল বিষয়টিকে সমৃদ্ধ করতে গবেষণার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসবেন, নব প্রজন্মের গবেষকদের কাছে এটাই আমার প্রত্যাশা।